প্রথম আলো

চার ক্যাম্পাসের চার প্রিয় মুখ

জিনাত শারমিন

১৭ মার্চ ২০১৯, ১২:২৫

_

চারটি ক্যাম্পাসের চারজন পরিচিত মুখকে নিয়ে লিখেছেন জিনাত শারমিন

চৈতন্য রাজবংশী। ছবি: তন্ময় শিকদার

চৈতন্য রাজবংশী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সিনেমা ও গণিতের গপ্‌প

চৈতন্য রাজবংশীর জন্ম টাঙ্গাইলের ধলেশ্বরী নদীর একেবারে পাড় ঘেঁষে, এলাসীন গ্রামে। বাবা মাছ ধরতেন, দাদাও মাছ ধরতেন। কিন্তু চৈতন্য? তিনি ক্যামেরা হাতে

স্বপ্নের পেছনে ছুটছেন, একদিন হয়তো সত্যিই স্বপ্নটাকে স্পর্শ করে ফেলবেন। মাছ ধরা সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন বিস্ময় আর আনন্দে পিঠ চাপড়ে বলবে, ‘এই যে চৈতন্য, ও কিন্তু আমাদেরই একজন!’

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে স্নাতকোত্তর করছেন। সবাই তাঁকে চেনেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীনবরণের সময় তাঁকে বলা হয়েছিল একটা স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বানাতে, তখনই প্রথম তিনি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র সম্পর্কে জানতে পারেন। সাহস করে অন্তরালের গান নামে একটা চার মিনিটের চলচ্চিত্র বানিয়ে ফেলেন। ছবিটির প্রদর্শনী শেষে দর্শকের হাততালি নাকি থামছিলই না! তখনই চৈতন্য ঠিক করে ফেলেছিলেন, থামবেন না তিনিও!

একে একে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন। মাদকের ভয়াবহতার ওপর নির্মিত না ছবিটি ঢাকার শিল্পকলা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিসহ নানা জায়গায় প্রদর্শিত হয়েছে। ছিটমহল সংকট নিয়ে বানানো চৈতন্যের ছবি পরভুঁই দখিনা আন্তবিশ্ববিদ্যালয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় সপ্তম হয়েছে। তবে তাঁর বানানো চতুর্থ চলচ্চিত্র প্রারম্ভ তাঁকে পুরো ক্যাম্পাসে নির্মাতা হিসেবে পরিচিতি এনে দেয়। এই ছবির টিকিট বিক্রি থেকে উঠে এসেছিল প্রায় ১৬ হাজার টাকা। পুরো টাকাই তিনি দান করেছিলেন সুনামগঞ্জের বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য। চৈতন্যের ভাষায়, ‘এই সিনেমাটা আমাকে এত ভালোবাসা দিয়েছে, যেটা আমি কখনো কল্পনা করিনি।’ পঞ্চম ছবি প্রত্যর্পণ দেখতেও প্রায় ৫০০ দর্শক হয়। এই প্রদর্শনীর পুরো টাকাটা চৈতন্য দান করেন তাঁর ক্যাম্পাসেরই ক্যানসারে আক্রান্ত জুনিয়র মিজানের চিকিৎসায়। ফোনের এপাশ থেকেই ওপাশের উচ্ছ্বাস টের পাওয়া গেল, ‘জানেন, মিজান এখন আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছে।’

ছবি বানানোর এত ব্যস্ততার মধ্যে গণিতের হিসাব মেলান কখন? জানতে চাইলে বলেন, ‘ভাইভা পরীক্ষাতেও স্যাররা আমার কাছে সিনেমার কথা জানতে চান।’ যাত্রাপালা ও থিয়েটার করেছেন চৈতন্য। বাঁশিটাও বাজান চমৎকার। চৈতন্যর বিশ্বাস, সিনেমা একদিন তাঁকে অনেক দূর নিয়ে যাবে।

সাদিয়া সিরাজ। ছবি: মুঈদ হাসান

সাদিয়া সিরাজ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

গানে গানে অর্থনীতি

সাদিয়া সিরাজ সাবা পড়ছেন অর্থনীতি বিভাগে, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু সব ছাপিয়ে শিল্পী সাদিয়াকেই সবাই গ্রহণ করেছে। যদিও গানের জন্য তিনি পরিচিতি পেয়েছেন বেশ দেরিতে। এর আগে আঁকিয়ে হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। টুকটাক লুকিয়ে একটু–আধটু গান যে করেননি, তা নয়। উচ্চমাধ্যমিকে আন্তকলেজ প্রতিযোগিতায় আধুনিক গানে কীভাবে যেন প্রথম হয়েছিলেন। ক্রেস্ট হাতে নিয়ে সেই দিনই প্রথম উপলব্ধি করেন, গানটাই তিনি করতে চান। কিন্তু গানে আবার মা-বাবার মত ছিল না। আঁকতেন ভালো, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্যে পড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষার দুই সপ্তাহ আগে সড়ক দুর্ঘটনায় ডান হাতের তিনটি আঙুল ভাঙে, সেই সঙ্গে ভেঙে যায় স্থপতি হওয়ার স্বপ্ন। ব্র্যাকে ভর্তি হয়েই সদস্য হিসেবে যোগ দেন কালচারাল ক্লাবে। সম্প্রতি সেক্রেটারি হিসেবে পদত্যাগ করেছেন।

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্যাম্পাস থেকে গিয়েছেন গুজরাটে, পাঁচজনের দলের একজন হয়ে অংশগ্রহণ করেছেন সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি (সাউ) ফেস্টিভ্যালে। একই বছরের সেপ্টেম্বরে অংশ নিয়েছেন পাঞ্জাবের বিশ্বমিলে। এখানে 'আনপ্লাগড'–এ তাঁর দল তৃতীয় ও 'ব্যাটেল অব দ্য ব্যান্ড'–এ দ্বিতীয় হয়। এ ছাড়া বিশ্বমিলে সাদিয়া ব্রাশ পেইন্টিং এবং স্কেচিংয়েও অংশ নেন। তিনি মূলত ভোকালিস্ট। ছোটবেলায় যেহেতু গান শেখা হয়নি, 'শিক্ষার কোনো বয়স নেই' সূত্র মেনে ছায়ানটে রবীন্দ্রসংগীতে প্রথম বর্ষ শেষ করেছেন।

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির আশপাশের টংদোকানগুলোতে চা খেতে গেলে প্রায়ই সাদিয়াকে শুনতে হয়, 'আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি' কিংবা 'আপনিই তো সেদিন নিজামউদ্দীন আউলিয়া গানটা গাইলেন, তাই না?' এসব ভালোই উপভোগ করেন তিনি। ক্যাম্পাসের যেকোনো অনুষ্ঠানে তাঁর থাকা চাই। সাদিয়ার ভাষায়, 'ওরা ডাকলেও যাই, না ডাকলেও যাই।'

বর্তমানে আরমীন মুসার 'ঘাসফড়িং কয়ার' দলের সঙ্গে কাজ করছেন সাদিয়া। ভবিষ্যতে দেশের বাইরে গিয়ে ইন্টেরিয়র ডিজাইনের ওপর ডিপ্লোমা করতে চান। স্থপতি হওয়ার যে স্বপ্নটা অপূর্ণ রয়ে গেছে, সেটাকে খানিক পূর্ণতা দিতেই এই ভাবনা। চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে থাকা সব দূরত্ব দূর করার জন্য প্রস্তুত যে মানুষটি, স্বপ্ন একদিন নিশ্চয়ই তাঁর জানালায় এসে ধরা দেবে।

জুবায়ের আলম ছবি: মাহফুজ অন্তর

জুবায়ের আলম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কলম কথা বলে

কলেজের প্রথম দিনের পরিচয়পর্বে শিক্ষক যখন একে একে সবাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘কী হতে চাও?’ জুবায়ের আলমের লেখক হওয়ার ইচ্ছের কথা শুনে সেদিন সবাই বেশ একচোট হেসে নিয়েছিল। কে জানত, একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই এই স্বল্পভাষী, অন্তর্মুখী, চুপচাপ ছেলেটিকেই লেখক হিসেবে চিনবে!

জুবায়ের আলম পড়ছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চতুর্থ বর্ষে। ছোটবেলা থেকেই প্রচুর কার্টুন, ক্যারিকেচার আঁকতেন। চাইতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় পড়বেন। ভর্তি পরীক্ষাও দেন। সম্মিলিত মেধাতালিকায় হন অষ্টম। কিন্তু বাদ সাধলেন মা–বাবা। অন্য অনেক মা-বাবার মতোই চাইলেন, ছেলে যেন ‘ভালো’ কোনো বিষয়ে ভর্তি হয়। তাই মা-বাবার মন রক্ষা করে বাধ্য হয়ে পরের বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন। প্রথম বর্ষে জুবায়েরের সহপাঠীরা তাঁকে চিনত টি-শার্টের ডিজাইনার হিসেবে। দ্বিতীয় বর্ষে তাঁর নতুন পরিচিতি তৈরি হলো—ক্যালিওগ্রাফার হিসেবে। তৃতীয় বর্ষ থেকে জুবায়েরের পরিচয় বদলে যায়। বনে যান লেখক। ইতিমধ্যে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত প্রকল্প (২০১৮) এবং শব্দযাত্রা লেখক সংঘ (২০১৯)

নামে দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এসব বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণও তাঁর নিজেরই করা। তা ছাড়া প্রথম আলোর ছুটির দিনে ক্রোড়পত্রেও বিভিন্ন সময়ে তাঁর ১২টি গল্প প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে ৩টি পুরস্কারও পেয়েছে।

ঢাকা কমিকস তরুণ লেখক ও আঁকিয়ে প্রকল্পের অধীনে একটি সংকলন বের হয় ঢাকা কমিকস ডাইজেস্ট নামে। সেই সংকলনে জুবায়েরের ‘মহীত্রাণ’ গল্পটিও জায়গা করে নিয়েছিল। লেখালেখি ছাড়াও তাঁর অনেক দিনের ইচ্ছা কয়েকজন মিলে ‘স্কেচবুকিং’–এর একটি দল করবেন, যারা একটা জায়গায় বসে তার চারপাশের বিভিন্ন বিষয়বস্তু দেখে দেখে আঁকবেন।

চুপচাপ জুবায়ের শান্তভাবে, শক্তভাবে কলম ধরে যেতে চান অনেকটা দূর। রহস্যগল্প ও উপন্যাস লিখলেও ভবিষ্যতে সৃজনশীল এবং মননশীল প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি লেখার ইচ্ছা তাঁর। তবে আপাতত অর্থনীতিতেই মনোযোগ দিচ্ছেন এই লেখক ও কার্টুনিস্ট।

ফাইজা ইসলাম। ছবি: তাহিয়া ইসলাম

ফাইজা ইসলাম, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ

রংতুলি আর ক্যামেরা

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের যেকোনো অনুষ্ঠানে সবার আগে ডাক পড়ে ফাইজা ইসলামের। সে নবীনবরণ হোক, কিংবা পয়লা বৈশাখ। তাঁর আঁকা আলপনা বিভিন্ন বিভাগ থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এসে দেখে যান। শিল্পী হিসেবে সবাই তাঁকে চেনেন।

ফাইজা ইসলাম পড়ছেন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষে। আঁকাআঁকির কোনো প্রাতিষ্ঠানিক হাতেখড়ি নেই। তবু এখন তাঁর হাত ধরে সব বয়সের অনেকেরই হাতেখড়ি হচ্ছে রংতুলির জগতে। ফাইজার বাবা আঁকতেন। কিন্তু মেয়ের বয়স যখন ১১, তখন তিনি চলে যান না–ফেরার দেশে। এরপর অনেক দিন অভিমানে তুলি ধরেননি ফাইজা। কলেজে ওঠার পর একাকিত্ব আর বিষণ্নতা পেয়ে বসে তাঁকে। এরপরই আবিষ্কার করলেন, রংতুলি তাঁকে বেশ সঙ্গ দেয়। তখন থেকেই মূলত আঁকাআঁকির ঝোঁক। স্নাতকে ভর্তি হয়ে আঁকাআঁকির পাশাপাশি এক নতুন নেশায় ধরল ফাইজাকে, তুলির সঙ্গে তুলে নিলেন ক্যামেরাও। এখন ছবি আঁকা, ছবি তোলা—দুটিই চলছে সমানতালে।

যেকোনো অনুষ্ঠানে প্রাণিবিদ্যার থিমে ডিপার্টমেন্ট সাজিয়ে সবাইকে অবাক করে দেন ফাইজা। বন্ধুরা তাঁর নকশা করা জামা পরে ঘোরে। বেসরকারি চ্যানেল আরটিভির ‘ভিট লুক অ্যাট মি’ অনুষ্ঠানে ডাক পেয়েছিলেন। ৬৪টি জেলার ফটোগ্রাফিক সোসাইটি মিলে যে প্রদর্শনী করে, সেখানে ফাইজার তোলা দুটি ছবি স্থান পায়। এর মধ্যে কিছু না ভেবেই কী মনে করে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট স্কুলে নিজের কাজ দেখিয়ে আবেদন করেছিলেন। ফাইজাকে অবাক করে দিয়ে ই–মেইলের জবাব পাঠিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পড়ার সুযোগের পাশাপাশি আংশিক বৃত্তিও পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বড় বোন হিসেবে ছোট ভাইবোনগুলোর দায়িত্ব তো ফাইজাকেই নিতে হয়, তাই আর যাওয়া হয়নি।

ভালো আঁকেন বলে প্রাণিবিদ্যার পড়ালেখা তাঁর জন্য সহজ হয়ে যায়। ফাইজা বলেন, ‘পরীক্ষার আগে যেকোনো চিত্র একবার দেখে গেলেই নিখুঁত এঁকে ফেলি। এ জন্য ব্যবহারিকে ভালো নম্বর পাই।’ এসব ছাড়া ফাইজা নাচ শিখেছেন। কলেজের অনুষ্ঠানে

দুইবার গান গেয়ে তাঁর আরও একটা প্রতিভা জানিয়ে দিয়েছেন সবাইকে। স্নাতক শেষে শান্তিনিকেতনে আর্টের ওপর ডিপ্লোমা করতে চান ফাইজা।